নন্দিতা বসু

ও

অমিতাভ গুপ্ত-কে

সূচি

কম্পোজিশন

বিকেলের জালিকাটা আঁধার-হলুদে
বাঘের চোখের মত আধুনিটা জ্বলে জ্বলে 'বয়'কে জানায়
তার পাঁচ আনাই টিপ্‌স্‌। আর পেয়ালায়
নড়ে ওঠে সবচেয়ে শেষ অস্ত্র ; প্রত্যেক মুহূর্তে
আত্মহত্যা পুষ্ট হয় কফি, চিনি, পানামা, চামচ-এ।

কারণ এখানে নেই পরিচিত বইগুলো, চেনা ঘ্রাণ, আর একটি বাড়তি পেয়ালা

'কাল রাতে কোথাও আগুন লেগে জ্বলে গেছে' ; আজকের 'পেপার'-এ খবর।
অবশ্যই তার শিখা নীল হয়ে পাশের বাগানে
রজনীগন্ধার সাদা দিয়েছে দ্বিগুণ করে ; রজনীগন্ধার গাছে আগুন লাগে না।
আজ সেই জ্বলে যাওয়া দু'-চারটে কাঠ-কুটো উনোনেও পড়েছিল। তৈরী তাই
সাধারণ আত্মহত্যা, বিকেলের কফির পেয়ালা।

যুবকেরা, অথবা সে একটি যুবক,
ভেবে দেখল আসলে এসব কথা অর্থহীন। নির্বিরোধী জ্বালা।
গাঢ় গন্ধভরা স্মৃতি পেলে সেটুকুই লাভ। তারপরে মৃত্যু থাক,
ঘোলাটে জীবন থাক ; একদিন অল্পক্ষণ স্তন ছিল, স্বেদ ছিল, নিঃশ্বাসের তপ্ত স্বাদ ;
বহুদিন এ টেবিলে কফির আরক ভরা দু'দুটো পেয়ালা
প্রতিজ্ঞায়, প্রতীক্ষায় ছলকে গেছে। চূর্ণ স্বরে বেজে গেছে গায়ে লেগে।

ডোরাকাটা অন্ধকারে ঘড়ি বাজে : নীল ছিল সে কটা মুহূর্ত।

কফিপানে আত্মহত্যা শেষ করে উঠে চলে যায়
যুবকেরা, অথবা সে একটি যুবক। যে রং আকাশে মুছে যায়
সে রঙে অপটু হাতে এঁকে চলে প্রেমের কবিতা।

প্রেম

গভীর মন্দির হতে মন্ত্র ওঠে হৃদয় শব্দের উচ্চারণে
সান্ধ্যপাখী দুই ডানা আলো আর অন্ধকার চক্রাকার নিয়ে
ওঠে, নামে ; সময়ের, পৃথিবীর ছোট ছোট ঘূর্ণি ছুঁড়ে মন্দিরের ত্রিশূল চূড়ায়।

অরণ্যানী শুধু ঘেরে মন্দিরের প্রাচীন দেয়াল
কালান্তরে সহস্র শিকড়ে চিন্তা বহুফণা রহস্য ভীষণ
জীবনের রস টানে। বলিরেখা বংকিম সাপেরা
অন্ধকার নদী, নৌকা, পিছল বিদ্যুৎ,
চমকায়, ফোঁসে, হায় কবেকার লক্ষ্মীন্দর, কবের বেহুলা।

দারুণ জোৎস্নার রং ঢেউয়ে ওঠে আহা কি মূরতি
দ্রুততর অন্ধকারে ঢেউ নামে আহারে বিষাদ
রক্তের প্লাবনে নামে বহু চুনি, একটি হৃদয়
সকালের বুকে স্রোতে নীলাভ বনের রেখা,
আহা ক্লান্তি গৌরীবাহু গ্রামবধূ জল নিয়ে আসে।

[আর অন্য রৌদ্রের জীবন]

জীবনের সঙ্গে আসে শকটের স্বভাবে উপমা,
দর্পণে তির্যক আলো সূর্য হতে অরণ্যে বিম্বিত ;
ইতিহাস মহান দেশের চূর্ণ অট্টালিকা, স্তম্ভ ও অলিন্দ ;
অজস্র অরণ্য কোনো অমর আনন্দগানে অভ্যস্থ স্থপতি।

[চিরদিন]

বৃদ্ধ মহীরুহ তার পরিণত ফুলকে ফোটায়
এক ফুল লাল অগ্নি সর্বত্র জ্বালিয়ে
কাঁপায় ভৌতিক শিখা, সুগুপ্ত কামনা
কাঁপায় উলংগবৃক্ষ জ্বলন্ত বিস্ময়

কাঁপায় কন্দরে নীল পুষ্প, আর একটি চেতন
ভোরেতে ঘুমায়। কাঠপোড়া উগ্র গন্ধ মধু
ভাসে বাতাসে হাসে শেষ রাত্রি নীল চাঁদ।

গভীর মন্দির হতে মন্ত্র ওঠে হৃদয় শব্দের উচ্চারণে
সারাদিন সারারাত্রি দূরবনরেখা দেখা যায়
আমরি পুত্তলী পূজা থালায় অগুরু
আমরি হৃদয় ঘনগন্ধ আলো জ্যোৎস্না বনগন্ধ একাত্ম নিবিড়,
মন্দিরে সময়বন জটা গড়ে ; ভাঙা দেয়ালেতে ঠেস
দেয়া সেই ক্লান্ত হৃদয়
করুণ একাকী ; ছায়া-আলো আবর্ত রচনা করে গুটি বোনে সেই সান্ধ্যপাখি।

অনন্ত মৃত্যুর নদি মৃত্যুহীন শস্যকে ফলায়, বনে লাল শিখা কাঁপে
উথালপাথাল চাঁদ টলমল কাজল গড়ায়
দু'এক বুনন দেওয়া কংকালের উপর প্রতিমা, প্রতিমার দুই চোখ।
প্রবল বাতাস ঘেরে, অরণ্যানী দূরতর, অনন্ত মৃত্যুর তীরে বাতাস ভীষণ।

গভীর মন্দির হতে মন্ত্র ওঠে হৃদয় শব্দের উচ্চারণে
মন্দিরের মন্ত্র ওঠে হৃদয়ের শংখঘরব্যাপী
সঙ্গীতের শেষ সুর ডাকসাজ খুলে
একা তার ছায়া-আলিংগনে রত নগ্নমূর্তি হয়ে
(পাথরে জলের রেখা অস্পষ্ট আলোয়)
অসংখ্য ছায়ার সঙ্গী একবনে মাটির আঘ্রাণে
সহস্র বর্ষের ভিড়ে অনেক গভীর হয়ে আসে।

লক্ষশাখা লক্ষ বাহু কাংগাল কামনা।
হা হা হতাশায় এক ভালবাসা সাপটিয়ে ধরে,
বহু লক্ষ হৃদয় অনেক কাছাকাছি ; সময়স্পন্দন শোনা যায়।
বহু পুরুষের বুক পেশল ভীষণ,
বহু কোমল, করুণ, রুদ্র নর্তকীর স্তন,
বহু যোনি, বহু লিঙ্গ, বাহু, উরু, সবল জীবন।—
অনন্ত তপস্যা দিয়ে গভীর মন্দির, চপলা অপ্সরা নদী চারিদিকে নাচে,
হোমাগ্নি জ্বলন্ত লাল ছুঁয়েছে আকাশ ;
ইন্দ্রের আসন টলে। শচীর মাংসকে ছোঁয়া ইন্দ্রের নখর।

হোমাগ্নিতে আভাসিত দীর্ঘতপা রাত .
পাতা ঝরে ভোরের সময় ।
দেহের বল্মীকস্তূপে সাদা জীর্ণ ঝর ঝর ঝরে যাওয়া সাদা পাতা, সাংসারিক বয়স
উল্টানো,
তার মধ্যে রত্নাকর জন্ম নেয় ; রক্তে, মাংসে, দুঃখে, বেদনায়, তারো উর্ধ্বে ।
(কারণ মানুষে আছে জ্বলন্ত শিখা-ই ;
অণিমা শিক্ষিত, তবে প্রকৃত বৃহৎ, আর,
মানুষের রহস্য অপার ।)

জ্যোৎস্নায় জীবিত পৃথ্বী তার বাইরে মহাশূন্য
ময়ূরাভ নীল জমা ঈথারের মত শূন্য শূন্য শূন্য শূন্যতায়
হলুদ রিবেট করা, টারেট, মিনার, জাগতিক অসীম নগরী ।
আলোক-বর্ষ কত শত ও সহস্রগুণ তারো, তত দূর
এমন নক্ষত্র আছে
যা এখনো আমাদের চোখে
রূপশালী ধান থেকে খৈ-এর মতন
ফোটেনি । নৈবেদ্যের ফুল হয়ে গড়ায় নি ।
তাকে মাঝখানে রেখে
বিশাল মন্দির মধ্যে মন্ত্র ওঠে কক্ষে কক্ষে, গ্রহে গ্রহে মূর্ছাহত সুতীব্র নক্ষত্রে,
তাকে মাঝখানে রেখে
গভীর মন্দির হতে মন্ত্র ওঠে হৃদয় শব্দের উচ্চারণে ।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯২৫, কলকাতা) গৃহশিক্ষকী জীবন

স্নীতি, তোমার কররেখা গুণে গুণে
সাগর, শামুক, গাংচিল, ঝোড়ো ডানা,
ঝাপটানো আলো, দিনের গন্ধে নেশা :
স্নীতি, টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কেন হাসো ?

স্নীতি, তোমার দাঁতের সীমায় আলো।
তুমি যেন কোনো বনের বিজ্ঞাপন ;
সবুজ, গভীর রহস্যময় দেহে
স্তনেরা আনত হৃদয়ের ভার নিয়ে।

পায়েতে তোমার ঋতু বসন্ত টেনে
কেন দুরন্ত বাসো দূরান্ত হতে :
লিপটন চায়ে কাপ ধূমায়িত করে
টেবিলেতে রেখে ঝুঁকে পড়ে কেন হাসো ?

আসলে স্নীতি, বই পড়ানোর কথা,
আমি শুধু জানি পুরোনোগন্ধ খবর।
আমি শুধু জানি বোবা জীবনের বেত,
বইয়েতে পড়েছি বেতসফলেরা চোখ।—
আসলে কি তুমি অরণ্যরেখা, আলোর সাগর ?
আমার চাদর ভরা শুধু সব প্রাচীন উপমা ;
আমি দারুভূত : তুমি কেন হাসো, কেন,
হঠাৎ থমকে চোখে তলোয়ার ফলা,

কানপুর হতে কেনা ইস্পাত ছুরি
ছুরির ব্লেডের উল্টানো পিঠে রাত
এপাশ-ওপাশ আলোয় ভাসানো নদী ;
চোখের পাপড়ি কেঁপে কেঁপে রাত বাড়ে।

চায়ের গন্ধে হাসির গন্ধে আমি উন্মনা
বইয়ের পৃথিবী মলাট বন্ধ রাখি ;
তুমি চুপচাপ বাঁ-হাতে সোনার বালা,
ডানহাতে নিয়ে আমার অজানা সুর।

স্নীতি।

বৃষ্টির ছবি এঁকে

চারিদিক হতে এল মেঘ, আমি চতুষ্কোণ একখণ্ড অন্ধকারে
ছায়াচ্ছন্ন ঘাসে ঘাসে কি এক দুর্বার কান্না শুনতে পেলাম ;
মোটা মোটা জলবিন্দু তবলার মতো এসে আঘাত করল মাটি
আমি ততক্ষণ শুধু মনে করি কাকে যেন ভালবাসি, কাকে যেন ভালবাসতাম।

চারিদিকে প্রকৃতিরা দুর্জ্ঞেয় ছবির মতো হয়ে এলে হাঁটতে শুরু করি
পেশল কৃষ্ণাঙ্গ সব মানব-মানবী দেখি অঙ্গীকারে মত্ত হয়ে আছে
ধানেরা উদাস হাওয়া অন্ধকারে চারণের মতো মাথা দোলায়, গান গায়
আমি এক নূতন নায়িকা খুঁজি যার হীরার নাকছাবি জ্বলে —

আলোক-প্রত্যাশী আমি। পিপাসার্ত, মৃতসঞ্জীবনী ঝর্ণা খুঁজি,
যাকে ভেবে আসছি তার হীরাবিন্দু নাকছাবি বুঝি
দুরন্ত হাওয়ায়ও শুধু স্থির আলোকের মতো। পিপাসার জলাশয়।
রূপেতে মূর্ছিত করে, তার সঙ্গে দেখা হলে এত বৃষ্টি, এর মধ্যে কুটিরও এসে পড়ে।

তাকে পাওয়া অবশ্য কঠিন। ইতিমধ্যে পুরাতন প্রণয়িনী চেতনা মথিত করে
মেঘ-জলে ;
আমার চারকোণা ছবি অন্ধকার, তার মধ্যে আমাকে সহজে আর পাওয়াই যায় না।

সে

বরাঙ্গে মৃত্তিকারেখা. নাভিমূলে নদীর মোহনা ;
পয়োধর পীবর, বিবর যোনির যেন দূর অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড
কুক্ষিতে বাদলমেঘ একজোট. বৃষ্টি নামে শরীরের অবিশ্রান্ত ঘামে,
মেঘনদীবৃক্ষলতাপাতা দিয়ে হাসি,

আফ্রিকা বিছানামধ্যে,
জ্যোৎস্নামুখে ঘুমন্ত এশিয়া।

বছরশেষের কবিতা

তোমাকে

আমি নির্বোধ নই, তবু ফুল এনেছিলাম,
আনারসের পাতা ঝকঝকে তলোয়ারে
রৌদ্র বিদীর্ণ করে হেসেছিল ;

বাঁধানো আলোয় তোমার চোখের প্রতিবিম্ব
টলটল করে উঠলো, ঢিল ফেলার মতো একটা কালো ভ্রমর
আমার বাগানে আনলো পাহাড়ের সুর।

সন্ধ্যে হয়ে এলো

সন্ধ্যে হয়ে এলো ;
আমার কাঁধের বাঁক হতে ঝুলছে মৃৎপাত্র,
হিরণ্ময় সূর্য অস্ত গেছে,
ঠাণ্ডা নামলো, বাড়ি ফেরা; বাড়ির উঠোনে

কেউ নেই, কেউ নেই।

নির্জনতাকে ছাড়তে

গগনে আমি একটুখানি দেশলাই জেলে
সে রাতের মতো একটি কাটল পথ
ফসফরাসের স্ফুরণের মত পেলাম, নাহ'লে
চিরদিন ধরে সাথী হ'ত পর্বত।

বৃষ্টি নামলো

বৃষ্টি ঝরে রাত্রিদিন,
তাই তো তনু সঙ্গহীন
বাঁশের পাতা, জলের ফোঁটা,
মাছগুলানের ভেসে ওঠা,
একলা আমি একলা আমি,
নই ঠিক করে একলা আমি।
আমার কাজিন — সঙ্গী সে।
মধ্যযুগের দুর্গে তাই
দাঁড়িয়ে আছি ; ঘুরুকগে
সুখ-দুঃখ, কালের চাকা :
আমার বাসে সীটগুলো সব
কমলালেবুর চোকলা ছাড়া
বেজায় ফাঁকা, বেজায় ফাঁকা।
আমরা যদি দাঁড়িয়ে থাকি
মিলের চাকা ঘুরুক গে।
পিক্‌নিক্‌টা বৃষ্টিতে
বন্ধ হল। বাস থামিয়ে
হারিয়ে আছি কিছুক্ষণ
পরস্পরের দৃষ্টিতে।

'চল্‌ হারায়্যা থাকি অ্যামন
জলরা নামুক চক্ষেতে।
তর বাপের আর আমার মায়ের
রক্ত থামুক বক্ষেতে।
জল হয়্যা জাই, চল্‌ হয়্যা জাই,
বাবলা বনের বাতাস হয়্যা
রাত্রি দেখি ক্যালক্যালায়্যা ;
তর ধাঁরাল্‌ গোরা নাকে

পীরিত কান্দে ছ্যাখতে পাই,
চল্ না তাই,
বনের মইধ্যে আমার গান গাইতে জাই ;
আমারও তো মায়্যালোকের হান্
ইকটু জ্যান কান্না পায়।'

আমি যদি

অরুণিমা, আমি যদি মেয়ে হতাম, তুমি যদি ছেলে হ'তে,
তোমায় আমি যোগী করে পাঠিয়ে দিতাম পর্বতে ;
অরুণিমা, তার বদলে, আমি হলাম ছেলে, তুমি মেয়ে
প্রজাপতি দেখল শুধু তেরছা করে চেয়ে।

বিরক্ত ভাই কফিহাউসের টেবিলকে

বোবা হ'লে কী মজাটা হ'ত
ফুল নিয়ে আসতাম থোকা থোকা
আমার ভাষার সব ফুল হ'ত ;
চুপচাপ থাকতাম, ভুল হ'ত না।

তোমার আসা

সেই একবার আলোর থেকে তুমি নেমে এলে
অন্ধকারের মতো, আমার চোখেরা সব অন্ধ হ'ল,
আমার সবই অন্ধকার।

শেষ

স্তবের মতো হৃদয় রাখো,
পৃথিবী নিস্তব্ধ হয়ে আসুক
তারপর প্রভুকে ডেকো,

তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন না,
কিন্তু তোমার হৃদয়ে তবু শোনা যাবে সহস্র ঘণ্টার ধ্বনি।
মেঘে কালো হয়ে আসবে পৃথিবী,
বৃষ্টি নামবে, ছাদে ছাদে চটাপট আওয়াজ শুনবে,
বন্যা গর্জাবে।

ক্ষমা চাইছি

একটু অনন্ত, একটু বসন্ত, একটি ছন্দ ;
প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা ছিল।
কর যুক্ত, আমি অনুপযুক্ত, দূরের গন্ধ
আমায় দিশেহারা করে দিল। তাই ক্ষমা।

শিল্পীবন্ধুকে

মেঘ থেকে কি আশ্চর্য স্নেহ ঝরে অন্তর্রৌদ্র প্রেমে
সেই কথা লিখে রেখো। আইভরি মিনারেটে স্টিললাইফ,
আমি সিগারেট-দগ্ধ তোমাদেরি দিকে চেয়ে আছি ;
এঁকে দিও দিবসের নগরীতে একা ঘোরে অবাক দৃষ্টিতে
সেজানে'র ছবি-ফল জিজ্ঞাসায় প্রাচীন যুবক
তার চোখে জল ঘোরে ; এসো যীশু, নববর্ষ এসো।

নরেন্দ্রনাথ : চাষা

আল্লাকে বললাম মেঘ দিতে,
মেঘ না চাইতেই পানি ;
আল্লার জবানি পেলাম।

রামকেলী

প্রবালদ্বীপের মতো আমার একটি ভোর হলো,
কুয়াশায় নীল মহাপৃথিবীর দূরত্ব নির্ভার ;
সাদা-নীল-ঢেউয়ে-স্বপ্নে গত দিনগুলো
ঢেউয়ের নিচেতে মাছ, মাছেদের নাচ।

প্রবালদ্বীপেতে আমি নারকেলী হাওয়া বসে শুনি
গেরুয়া আলোয় নীল বনসিঁথি ঈষৎ রাঙানো,
আভাসে বনের গন্ধ, পা ঝুলিয়ে ঢেউ ভাঙা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া,
অনেক রঙিন মাছ পায়ে ঘাই মারে ;
প্রবালদ্বীপের মতো আমার একটি ভোর হলো।

জলে, কুয়াশায় আমি সময়ের সেতু পার হ'তে
পারাণির কড়ি শুধু একটি মাণিক্য নিয়ে বসে আছি,
নীল শীর্ষে সূর্য-রং ঠিকরায়।

অমিয়া রাগিণী আর অস্পষ্ট ঈথার।

যাত্রা

১.

বুকের ভেতরে সব মাঝি-মাল্লা গান করে করে
একে একে বার হয়ে এলো। মাথায় গামছা বাঁধলো,
কোমরে লেঙ্গট কষে যাত্রা করবার আগে
এ ওর পেশীর জোর টিপেটুপে দেখে নিল,
চেপে-চুপে বসে পড়ল একই নৌকোয়, যাবে পলিনেশিয়ায়।

২.

নৌকো চালানো আমার অভ্যাস,
এঘাটে, ও ঘাটে কামিনেরা,
আমি মাঝ-দরিয়ায় গানে-তুফানে
ঈশ্বরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি।

ঈশ্বরনারীনক্ষত্র

শুকনো আলোয় মৃত্যু ঝুলছে ; ফসলের ক্ষেতে, শোনা যায়, ঈশ্বর।
চাকতির মত সুপুরি কুচিয়ে নক্ষত্র ফেলছে গ্রামবধূরা,
ঘরে-গৃহস্থালীতে তাদের বেশ ঘামের গন্ধ আর অধররসের ছোঁয়া ;
আর অনির্বচনীয় কাঁঠালপিঁড়িতে উত্তাপ,
আর তেজালো বহুপ্রাচীন ঈশ্বরহত্যার খবর পাওয়া যায়।

রৌদ্রের সঙ্গে মৃত্যু, আর মৃত্যুর সঙ্গে নারী, আর নারীর সঙ্গে আবহমান,
আর নারীর সঙ্গে সুপুরির মত সব মেলানো শব্দ,
আর সত্যিকারের মেয়েদের নীল টিপ,
আর মিথ্যাহৃদয়ের মেয়েদের ঈশ্বর হননের কাহিনী,
আর মিথ্যাহৃদয় মেয়েদের আমাকে হননের কাহিনী,
আর নারীর সঙ্গে সুপুরির মত সব মেলানো গন্ধ
আমার চেনা বুকে একই অভিভূত বেদনাকে এনে দেয়,
চিরটা কাল।

অথচ আমি কিংবদন্তী এবং নক্ষত্রে একসময় সারল্য উপহার দিয়েছি,
এবং আমার কাছে ঈশ্বর বলতে একমাত্র মেয়েরাই ছিল ;
ইদানীং কবিরা যখন তাদের বর্জন করেছেন বিতৃষ্ণায়,
তখনও আমি তাদের তৃষ্ণা বলেই জেনেছি,
কারণ আসল একটি মেয়েকে আমি বন্দীঘরের দেয়ালের
এদিক ওদিক দু'দিকেই দেখেছিলাম।

আমার পাঁজর, সে বলেছিল যিশুর অথবা ঈশ্বরের
আর হাজার হাজার আলো চোখে ফেলে সে সজল ভালবেসেছিল,
অন্তত তাকিয়েছিল, আর আমি তাকে ভালবাসা বলেই জানতাম,
ভেবেছিলাম, দ্রোণফুল যেমন জানি না, অথচ নিশ্চয় আছে জেনে খুঁজি,
ঠিক তেমনিই নদীতীরে সে নিশ্চয় মাঝে মাঝে ঈশ্বর খুঁজেছে।

সে তার নিজের দিকে চেয়েছিল নির্নিমেষে,
সে তার চকিত চাউনি পাখি করে ঈশ্বর উদ্দেশে
পাঠিয়েছে, তা দেখেছি।   সে আবার ব্যাধ হয়ে
নিজের জালের মধ্যে নিজের পাখিকে নিয়ে ধরা পড়েছিল ;
তা দেখেছি।

সেই একটা মুহূর্ত ছিল যখন বাসনা নক্ষত্রের মত হয়ে গেছে তার,
আজ টেলিগ্রাফে খবর আসে ঈশ্বর মৃত, নারী জীবিত
নারী মৃত, ঈশ্বর জীবিত। টেলিগ্রাফের খবর সর্বদা ঠিক বোঝাও যে যায়, তা নয়

অস্পষ্ট আনারসে দাঁত বসানোর স্মৃতির মত মনে পড়ে সেই রমণী,
আনারস পাতার থেকে ঝুলে পড়ছে লক্ষাধিক মৃত যিশু,
ফসলের ক্ষেত থেকে বিবর্ণ একটা পচা গন্ধ,
আর তেজালো রসনাগুলো শুক্‌নো ঈশ্বরের ঝাল পাকশালায় প্রস্তুতিতে বসে।

সমস্ত বাংলাদেশে কড়াইয়ের রেখাগুলো চাঁদের গহ্বরের মত ধোঁয়া দেয়,
সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে খরতালে ঝন্‌ করে মৃত্যুর শব্দ দেয়,
সমস্ত বাংলাদেশে নানা চাকার ঘড়ির অভ্যন্তর-খোলা ছবি,
ভীষণ করাল জাঁতি থেকে সুপুরির পর সুপুরি নক্ষত্র গড়িয়ে পড়ে।

আলো শুকিয়ে আসলে বিবর্ণ মেয়েরা নৃত্য করে,
শুক্‌নো কঠিন আলোয়।   ফসলের খড়ে।
নৃত্য করে
(অথচ তাকে দেখেছিলাম)
নৃত্য করে
(তার চোখের জল, মুখ—সরে যাচ্ছে)
নৃত্য করে উদ্দাম
(আরো দূরে সরে যাচ্ছে)
খস্‌খস্‌ আওয়াজ হাওয়ায়।   ফিস্‌ফিস কান্না।   হা ঈশ্বর।

মন্নুনদী

মন্নু নামে নদী আছে
ওপারে বসতি আছে,
ওপারেতে ভালবাসা আছে।

এপারের থেকে ভাল লাগে।
কোনো কোনো দিন রাত্রি হ'লে
সে আলোয় ওপারের ছায়া
এপারকে ছুঁতে চায়,
ছোঁয়?

প্রস্তুতি

বহ্নিশিখা জেলে দাও দাঁতের উপরে,
রজনীগন্ধার চারা কোমরেতে রুয়ে দাও,
বেঁধে দাও নৃত্যে তাকে,

তারপর গ্রহে গ্রহে খবর পাঠাও।

সময়-স্থান মাত্রা

চোখের সামনে বন্য ফুল ও অন্য ত্রিসীম
ডেকো না এখন আগের কাউকে সন্তাপে;
শেষ হল সব পুরনো সময়, তাদেরো দিন।
চারের আঘাতে তিন কাঁপে আর দিন কাঁপে।

সেই প্রভাতে

ফুলের বাগানে ঘুরি একা একা,
সারসের সাথে কভু দেখা হয়,
সারসের সাথে কভু দেখাই হয় না;
ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা হয়,
আর আমি হয়ে যাই—তাদের খেলনা;
সারস কি খুঁজে পায়, সারস কি আমাদের খুঁজে পায়?

দুটি কবিতা

১.

যে কথা বলতে চাই দুয়ারে বৃত্ত হানে,
দরজা খোলা পেলে তোরঙ্ বাইরে যায় ;
যা কিছু চেনা সব লুকোনো পূর্ণিমায়।

একটি চেনা শাড়ি, তাতেও মৃত্যু আঁকা,
যা কিছু আমারি তাতে কে যেন মেলছে পাখা।
দুয়ারে করাঘাত, তবুও চুরি যায়।

ভীষণ বৃষ্টি আসে অনেক রাত হ'লে
ভীষণ জ্যোছ্না নামে সেগুন-শালপাতায়
গণ্ডি দিতে চাই সিঁদুর কৌটো কই

ভীষণ বৃত্ত রোজ দরজা ছেপে যায়
আমার দিন কাটে, চোরেরা দরজাতে,
তোরং চুরি হয় রোজই মাঝরাতে।

২.

আমায় স্পষ্ট করে বল দেখি নদী,
রোজই আমায় চুরি কর যদি,
রাত্রে কখন ফিরে আসি ?

আমায় একটু আবছা করে বলো
তোমার ঢেউয়ে তুমিই টলোমলো,
না আমি,

না মোহনাতে লুকনো সেই বাসনাহীন হাসি ?

তুমি প্রেম

তোমার কানের অলংকার দাউ দাউ করে জ্বলছে,
দেহের বহিঃরেখায় রেখায় কেটে নেয়া পৃথিবীর দাঁতের দাগ,
বাদামী ঘামের স্রোতে রুদ্ধশ্বাস উদ্বিগ্নতা, প্রেম, কাম,;

মুখ ওল্টালে চাঁদ,

খড়ের মতন চুল তালু ছোঁয়া ভীষণ আমার,
ঊর্ধ্বায়ত চোখ খুব সামে খুব সামে ঝুঁকলে
চশমা সরিয়ে নিলে, যন্ত্রণা, দূরযাত্রা,
অসহায় অবলুপ্তি, ভিন্ন দৃশ্য,
গাছ-গাছালিরা সব ভেঙে পড়ছে গোধূলিতে।

স্মৃতি : পিক্‌নিকে

খ্যাপা রঙের ছোপ পড়েছে—ঘাসে, মাঠে, কোন্ শতাব্দ ?—
বুকের মধ্যে আবোলতাবোল হাপর পাড়ে প্রেমের শব্দ।
সে নেই। কে নেই ? আবছা এমন। রং যদিও বৃষ্টি-হাওয়ায়
'এমন ঘাসের হরিণী নেই' : এই সুরেতে একলা গাওয়ায়।

খড়ের কাঠি হাবিজাবি। রোদন শুধু বুকের ইতর
বারে বারে মনে করায় সে বারান্দা, সে-ই ভিতর ;
ঘরবাহিরে, ছবির ভিড়ে, একলা ঘোরে। : দর্শনী
তাহার জন্যে, সে ই আবার। ভালবাসি। প্রেমকাহিনী।

যুবক বসে ছবি আঁকে। কবিরা কেউ কাব্য লেখে।
আমার চোখে হরিণ ছোটে অন্যঘাসে বৃষ্টি দেখে।
সেই অরণ্য, এই একাকী। ভালোই, তবু ভালোই আছি।
রেখার মানুষ তিনদিকেতে। আঁকতে তাদের কী রঙ বাছি ?

অন্ধযৌবনের আগে

একটা শালুক ফুল, একটা শালিক।
অভিমানী হাতের গয়নার মতো নলখাগড়া সব বেঁকে রয়েছে।
জলের মধ্যে একফোঁটা কুঙ্কুম, রাঙা মেয়ের গা-ধোয়া সৌরভ,
গলায় ছিপের দাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তিতপুঁটি,
তরতর করে সাঁতরিয়ে বেড়ায় খসে পড়া মুকুটের ফুল।

ঝগড়ার শব্দ।
রৌদ্রকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া, সন্ধ্যার ঠোঁট কাঁপছে,
ম্লান কান্নার শব্দের মত বেরিয়ে এল তারা, একটি,
তারপর হুহু করে অনেক জড়ো হলো।

স্খলদঞ্চলা সন্ধ্যা চন্দ্রপ্রেমে কুঙ্কুমমোছা যুবতী যখন,
তিতপুঁটি মুকুটের পাশে নলখাগড়ার নীচে চম্‌কে
ঠোকর মেরে ডুব দিল রূপকথার মণিটুকু নিয়ে,
তার হৃদয়, তার বিস্ময়, তার প্রেম।

ঋষির মত রৌদ্র তখন মহাবেদনাকে তার অন্তদেশে নিয়ে গেছে

তাদের গল্প

সারাদিন ধরে মহিষ চড়িয়ে পীতাভ নদীতটে
এক রাখাল বালক তার রূপসী অঞ্জনার কাছে ফিরে এল।

সেদিন মন্ত্রের মত বিহগস্বর, কাঁথার উপর প্রদীপ উল্টে পড়েছে।
সেদিন সারারাত ধরে আগুনের খেলা দেখল বিমূঢ় গ্রামবাসী
সেদিন ক্ষমায় আর কান্নায় অস্থির হয়ে গেল চৈত্রের সব ফুল
দরজার পাশে একত্র হয়ে যারা অপেক্ষা করছিল।

একরাশ ফুল সেই মেয়েটিকেই তার চেনার কথা,
উরুতে জোনাকপোকার গয়না তার, তালরসের গন্ধ,

অথচ কাঁথায় পিলসুজ, তেল, আগুন,
রূপসী অঞ্জনার নাকছাবি, গোঠ।

সাদা বৃদ্ধ মোড়ল বললেন, 'পাপ',
সাদা গরু কাঁপতে লাগল এককোণে,
ফুলের ছায়া তার গায়ে পড়ল।

কেয়াখয়ের গালে নিয়ে
গ্রামবাসিনীরা পরদিন গল্পে বেরুল।
গতরাত্রের তিনটি মৃত্যুর গল্প গোল ফুটির মত তাদের একটা চাই।

দুই জগৎ—লাইন

চেনা ছবি, অপরাহ্ণ, নদী,
নীল আগুনের রং প্রতীক্ষায় দুপুর অবধি।
তারপর নেমে আসে অবান্তর বিষণ্ণতা,
স্টেশনের রেলগাড়ী ধুলোয় হারায়।

চেনা পায়রার মতো
কাপড়ের এভাঁজে ওভাঁজে,
লুকোচুরি খেলা করে চিন্তাগুলি।

শুনে আমি কী আনন্দ পাব ?
দৃশ্যে দেখি সবই সদৃশ।
সেই দীঘি, মরালীও, সেই চেনা সুগম্ভীর বৃষ।

রোজই সকালে,
ছায়া ফেলে আসলে, নকলে,
ছবি ওঠে একই জীবন।

রেলগাড়ি ইশারায় ডাকে,
তার বাক্সে আরোহিণী, জানালায়, বাঁক ঘোরে,
ইস্পাতের ঠাণ্ডা হাত
নীলাঞ্জনে আকুল ছড়ায়।

লাইনের ওপারে পৃথিবী,
শ্রেণীযুদ্ধ জানি না কেমন, শব্দ শুনি।

তন্দুরওলা

খোঁচাদাড়ি বুড়োর মুখটা আগুনে গনগনিয়ে উঠল।
তন্দুর থেকে ভূনা আটার গন্ধ,
আর প্রাণপণে আমি উপনিষদ্ থেকে ছবিটা চাইলাম।

মুখটা হো-চি-মিনের মত,
আমি বিশ্বাস করতে চাইছিলাম না।

জন্মান্তর আর অতীন্দ্রিয় রহস্যের কথা ভাবছিলাম, ছবিটা মেলাতে চাইলাম,
আমার হাতে রুটির মজুরীর পয়সা ঘামছিল, আর তন্দুরে আগুন গাঢ় জ্বলছিল।

কমরেডকে

তোমার ঘৃণা রবিকিরণ হেন।
দাসত্বের মুক্তি দিয়ে প্রেমকে আনে যেন।
দ্বন্দ্ব অনেক, রক্ত অনেক,
পৃথিবীময় স্বপ্ন আরো অনেক আরো অনেক,
অনভ্যস্ত ডাল থেকে তার ফুলগুলি সব এই বেরুলো।

ফুলগুলি সব বাঁচিয়ে রাখ।
তীরধনুকের ব্যবস্থা আর পাশে কিছু জমাট ঘৃণা
জোগাড় করে রেখেই দ্যাখো, ফুলগুলি সব বাঁচে কিনা।

এবারের এই যুদ্ধ যেন
বিফল না যায়। এই হাটেতেই মুক্তি কেনো।

প্রকীর্ণ পংক্তি

"এদিকে যে ফসলে রণপা ফেলে রোদমাখা হাওয়ারা দৌড়োয়—"

পাপ

সাপের চেনা খেলা,
ভেলা ও বেহুলা
বেলা অবেলায়
রোদের রেখা টানে

প্রাসাদে কেউ নেই
প্রণত ছায়াসিঁড়ি
ইন্দ্র স্মিতহাসি

বেহুলা নেচে ওঠে
স্তনেতে রোদ ওঠে
বাগানে পাকে ফল
রোদনে শুষ্ক ফুল

বিকেল শুকনো হয়
বেহুলা নেচে যায়
দারুণ পিপাসায় ;
বাগানে ঢোকে সাপ ;

সাপের মত বাহু,
ইন্দ্র স্মিতহাসি ।

করুণ সন্ধ্যাবেলা,
ফেরৎ ভেলা যায় ।

ছায়াটা পড়ে থাকে
সোপানে, শাড়ি যেন ।

উষ্ণ, মূর্খ স্বেদ

সময়

'তাকে যদি বিসর্জন বলে মনে হয়,
জেনো তা গর্জন হতে পারে।' এই বলে গুরু
পাইপগান বিতরণ জ্যোৎস্নায় করলেন শুরু।

ছায়া ছায়া লক্ষ নির্বিবেকী
শাস্ত্রী এসে ঘিরে ফেলল মাঠ।

জ্যোৎস্নায় দেয়ালে রাইফেল
হরিণের শৃঙ্গে পাইপগান
অন্ধকারে থ্যাবড়ামুখো বীভৎস কামান।

সারারাত
জলাশয়ে শিশির পড়ছে
কোনো হরিণের রক্ত।

বিবাহের আগে

১.

বিকেল জোড়া বুট ও বুলেটের শব্দ ফুলের দোকানে।
সংহার সহর্ষ সহস্র। আরামে জনতা নিদ্রা যায়। ফুল গলায়।
নন্দিতা কবে আসবে? নববর্ষ, অভিনন্দন
জানাই তোমায় শংখ ও খই ছিটিয়ে। মৃত্যু
সে তো নিত্য, শুধু জীবন অনিত্য। চিত্ত থৈ থৈ নাচে।

কে বাঁচে কে মরে তাতে মাছের বাজারে কিছু দাম ওঠাপড়া
কখনো হয় না। শুধু পথ আটকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে মৃতদেহে।
সোনার মতন সব ছেলেমেয়ে ধীরে ধীরে পথঘাট মুড়ে দিচ্ছে সোনা দিয়ে।
ছোট ছোট কালীমূর্তি ফুটপাথে বিক্রী হচ্ছে,
কদাকার বুড়ো।

স্থূল আঙুলের চাপে বাংলাদেশ তৈরী হচ্ছে, দারুণ রিলিফ।
নন্দিতা কবে আসবে? দেহমনে তৈরী হয়ে বিপ্লবের প্রতীক্ষায় আছি।

শুধু পথ আটকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে মৃতদেহে।

অগত্যা জনতারা নিদ্রা ধর্মঘট করে বিছানায় শুয়ে আছে।

২

সেই নলটার হাঁ-করা মুখ থেকে
ছাড়া পাওয়া মাছের মতো বেরিয়ে এল বুলেট,-
লাল হয়ে উঠল অর্বাচীন রাগে,
তারপর সে-ইখানে ঢুকে পড়ল।

সেই জায়গাটায়
যেখানে তৈরী হচ্ছিল নূতন সমাজের স্বপ্ন,
প্রেম, জীবন, গাছপালা, কারখানা।

কাঁটাতার দেওয়া একটা জায়গায়
মাছটা ঢুকতে পারল না।

ভারী সীসের মত মরে পড়ে রইল মাছটা।

৩.

নগরীর অবসন্ন পটভূমিকায় যে এখনো আসে নি, তার ছায়া
ল্যাম্পপোস্টের উপর পড়ল। বুলেটের চিহ্ন প্রত্যেক বছরে,
প্রত্যেক মাসে মৃত্যুর খবর। আলো নিভে যায় যখন শহরের,
লড়াইয়ের শেষে সে এলো না। তার কথা ক্রমশই
পাখির অশুভ ডানায় চাপা পড়ছে। স্মৃতি আর স্বপ্নের
দুই পুস্তকের পাতায় ল্যাম্পপোস্টে তার ছায়ার চিহ্ন বিদ্ধ।

৪.

দ্বার খুলে দাও দেবতা। পথে অসংখ্য সৈন্য।
মহিষে মহিষে একাকার। কী যে গোলমাল।
চারিদিকে আলো, দেবতা। বুকে সহস্র শব্দ
সমবেদনায় নিঃসাড়। কত প্রয়োজন।

চীৎকার চাই দেবতা। বুকে বিদ্রোহী বৃক্ষ।
ফুলে ভরে দাও প্রতিকার। জলে জলাকার।
লগ্ন এসেছে দেবতা। দ্বার খুলে দাও দেবতা।

মহিষশৃংগে আলোক ঝুলাও, পুষ্পে বারুদরেণু।

মহিষে মহিষে একাকার। কী যে গোলমাল।
দ্বার খুলে যায় দেবতা। পথে অসংখ্য সৈন্য।

মৃতদেহ সব প্রশ্ন শুধায় কলকাতানামা মর্গে।

৫.

শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে বেঁকে গেছে ছবি
টিলা পেরেকের থেকে কবিতার ঝোলে লাল রবি

আপাতত শহরে সন্ত্রাস
মুখচেনা যুবকের চরম হয়েছে সর্বনাশ।

বাঁকা সূর্যটাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাফিয়ে উঠে সোজা করা যাচ্ছে না
চটের উপর মজুরেরা প্রতিজ্ঞার ছবি আঁকছে শুনেছি ;
ভেবেছিলাম শিল্পনগরী আমার নিজস্ব এলাকা।

পণ্ডিতের মতো আমি অর্ধেক করেছি ত্যাগ
রয়ে গেছে একমাত্র কলম ও অর্থশূন্য মানিব্যাগ

লাল রবি সোজা করে ধরো
গৃহকে সাজাও থরোথরো
চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে,

লেনিনের হারানো চেয়ার।

৬.

তেলমাখানো চটচটে সিঁদুরের সূর্য উঠছে চটের আকাশে,
কালি বুড়ো-আঙুল দিয়ে থেবড়ে মাখানো শেষরাত্রির অন্ধকার ছবি ;
ছবি-আঁকার মজদুর মেহনত করছে ভীষণ কয়েকরাত ধরে।
গায়ের ঘামে, তেলে, কালিতে, পেটের খিদেয়, প্রতিভায়,
এক অনবদ্য সূর্যোদয়ের ছবি এইসব মৃত্যুর মধ্যেও আঁকা হচ্ছে।

স্ত্রী

'মা, মাগো।'

দিলে ঘণ্টা, এবং সাগর ;

বাষ্পের মথিত স্বর।

অগ্নিবর্ণে অপ্রতিভ একা।

অশ্বত্থগাছের মত তুই উরু,

তার মধ্যে একা।

শেফালী কি বৃথাই খসেছে ?

তোমাকে দু'হাত দিয়ে ডাকি,

হেসে দাও দু'বুক আগুন,

চলে যাও আমরা ঘুমোলে।

শেফালীতে মৃত করে রাখো ;

তুমি কোন্ বাঁকা অভিমানে

রাতশেষে কোথা যাও ?

কারে পাও ?

অন্ধকারে নৌকা নিয়ে পূর্বপানে

হে বেহুলা, হে নাগিনী, হে অভিমানিনী !

আমি তো পশ্চিমে।

সূর্য তো পশ্চিমে হাঁটে !

অন্ধকার তবু যায় পূর্বদিকে ?

স্বর, ঝড়, নিঃশ্বাসের অন্ধকার, স্বপ্ন,

নিয়ে চলে যাবে যদি,

অশ্বত্থকে ফেলে গেলে কেন ;

ঘণ্টা যদি বাজবেই,

শেফালী কেন বা ঝরে ?

কেন

অগ্নিবর্ণে অপ্রতিভ একা ?